

ব্রিকসে অংশ না নেওয়া কূটনৈতিক ভুল, নাকি কৌশল

ভারতের নয়াদিল্লিতে গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষণ অঙ্গনে এক ধরনের শোরগোল সৃষ্টির অপচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বহুপক্ষীয় এই বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মের আউটরিচ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট মহল নানামুখী প্রচারণায় নেমেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারিত ছবি, সম্মেলনস্থলে উপস্থিতি এবং নরেন্দ্র মোদী, শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের মতো পরাশক্তিগুলোর শীর্ষ বৈঠকের আলোকচিত্র সামনে এনে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের দাবি ভারতে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্ট থেকে দূরে থেকে বাংলাদেশ নাকি এক অপূরণীয় কূটনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়েছে এবং এটি বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত। তবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে যারা কেবল শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিতি, ক্যামেরার সামনে করমর্দন বা যৌথ ছবি তোলার সুযোগ দিয়ে বিচার করেন, তাদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটি হয়তো অত্যন্ত সংকীর্ণ। বিশেষ গোষ্ঠীকে খুশি রাখারই অপচেষ্টা মাত্র। কূটনীতির খেলায় শেষ বলে কোনো কথা থাকে না।

কোনো সম্মেলনে যোগদান নিঃসন্দেহে সম্পর্ক উন্নয়ন, অনানুষ্ঠানিক বার্তা আদান-প্রদান ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের পথ তৈরি করে। কিন্তু সেখানে না যাওয়া মানেই কোনো রাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে বা দেশের বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে এমন ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এই সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মূলত কোন পরিচয়ে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেই আমন্ত্রণের পেছনের কৌশল কী ছিল এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব কতটুকু।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে এককভাবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে বা ব্রিকসের বিশেষ দ্বিপক্ষীয় অংশীদার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ব্রিকসের আউটরিচ অধিবেশনে তার কাছে আমন্ত্রণটি এসেছিল মূলত আঞ্চলিক সংস্থা 'বিমসটেক'-এর বর্তমান পর্যায়ক্রমিক চেয়ারপারসন বা সভাপতি হিসেবে। সংস্থাগুলোর নিয়ম অনুযায়ী সভাপতি পদটি আবর্তিত হয়, আর সেই প্রক্রিয়াতেই বাংলাদেশ বর্তমানে বিমসটেকের শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছে। ফলে তিনি যদি বিমসটেকের দায়িত্বে না থাকতেন, তবে এই আমন্ত্রণের হয়তো কোনো অস্তিত্বই থাকত না। বহু রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দেশের সার্বভৌম প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পদাধিকারবলে পাওয়া একটি আঞ্চলিক পরিচয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতি নতুন বা অভূতপূর্ব কিছু নয়।

রাষ্ট্রনেতারা সর্বদা নিজেদের জাতীয় নীতি, অভ্যন্তরীণ ও কৌশলগত অবস্থান হিসাব করেই সফর বা সম্মেলনে অংশ নেন। এই ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে বিশ্ব রাজনীতির অত্যন্ত প্রভাবশালী একাধিক দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব সশরীরে অংশ নেননি। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান নিজে না এসে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রতিনিধি হিসেবে

পাঠিয়েছেন। লাতিন আমেরিকার দেশ উরুগুয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এই সকল প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতারা বাণিজ্য করছে, সীমান্ত বিতর্ক নিয়েও বৈঠক করছে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জাম কিনছে। কিন্তু বাংলাদেশ যখন নিজের সার্বভৌম প্রয়োজন অনুযায়ী চীনের সঙ্গে পরিকাঠামোগত বা বাণিজ্যিক চুক্তি করতে যায়, তখন ভারতের গণমাধ্যম ও নীতি-নির্ধারণী মহলে অসম দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে সমতাহীন কূটনীতি পরিচালনা করা সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্তমানে এক জটিল ও অলঙ্ঘনীয় পর্যায় অতিক্রম করছে। তিস্তা, প্রাণহানি, তিস্তাসহ যৌথ নদীর পানি বণ্টন, তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন সমীকরণ দাঁড়ায়। ভারতের গণমাধ্যম ও নীতি-নির্ধারণী মহলে নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার গুঁজব তোলে। এই ধরনের দাবি কোনো অক্ষ হিসেবে রূপ নিতে দিতে রাজি নয় বাংলাদেশ। ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে পশ্চিমা অর্থনৈতিক বাজারে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা, অন্যদিকে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর নেতৃত্ব দাবি করা। ডলারের বিকল্প মুদ্রা চালুর আলোচনা বহু বছর ধরে চললেও তা বাস্তবে রূপ নেওয়া তো দূরের কথা, কার্যকর রূপরেখাই তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ডলারের বৈশ্বিক একক স্থানকে ধাক্কা দেওয়ার সামর্থ্য ব্রিকসের এখনো গড়ে ওঠেনি। একইভাবে, ব্রিকস প্রতিষ্ঠিত ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’, যার সদস্য বাংলাদেশ নিজেই, তা বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের প্রকৃত বিকল্প হয়ে উঠতে বহু দূর পিছিয়ে রয়েছে। ফলে ব্রিকস সম্মেলনে না যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থায়ন বা বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় অনেক ক্ষতি হয়েছে এমন দাবি একেবারেই অবাস্তব।

একটি গভীর কৌশলগত আত্মমর্যাদা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা কাজ করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল এই আমন্ত্রণকে এমনভাবে তুলে ধরতে যেন নতুন বাংলাদেশ নেতৃত্বকে অতি দ্রুত দিল্লির দরবারে হাজির করানো সম্ভব হয়েছে। বহুপক্ষীয় ফোরামের সভাপতির আমন্ত্রণকে দ্বিপক্ষীয় সফলতার মতো করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রোপাগান্ডা চালানোর যে মনস্তাত্ত্বিক ছক তৈরি করেছিল, বাংলাদেশ অত্যন্ত পরিপক্বতার সঙ্গেই সেই ফাঁদ এড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতি ব্রিকসকে চীনের আজ্ঞাবহ বা মার্কিন বিরোধী চরমপন্থী কোনো অক্ষ হিসেবে রূপ নিতে দিতে রাজি নয়।

আবার অন্যদিকে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর নেতৃত্ব দাবি করা। ডলারের বিকল্প মুদ্রা চালুর আলোচনা বহু বছর ধরে চললেও তা বাস্তবে রূপ নেওয়া তো দূরের কথা কার্যকর রূপরেখাই তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে পশ্চিমা অর্থনৈতিক বাজারে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা, অন্যদিকে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর নেতৃত্ব দাবি করা।

এর পাশাপাশি একই সময়ে সরকারপ্রধান হিসেবে ভারত সফরের জন্য একটি পৃথক দ্বিপক্ষীয় আলোচনার প্রস্তাবও বিবেচনার বিষয় ছিল। ফলে একটি আন্তর্জাতিক জোটের বহুপক্ষীয় সম্মেলনে যোগ দেওয়া আর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ দ্বিপক্ষীয় সফরে অংশ নেওয়া—এই দুটির অর্থ ও কূটনৈতিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহু পাক্ষিক সম্মেলনের লক্ষ্য থাকে সাধারণ ও বৈশ্বিক

ইস্যুতে সম্মিলিত অবস্থান প্রকাশ করা, আর দ্বিপক্ষীয় সফরে সমাধান হয় দুই দেশের ভূ-রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট মৌলিক সমস্যাগুলো।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার প্রথম ভারত সফরকে কেবল বহুপক্ষীয় আয়োজনের প্রান্তিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দ্বিপক্ষীয় সফরের জন্য ভারতের কূটনৈতিক সফলতা হলেও, কাঠামোগত দিক থেকে ব্রিকস এখনো একটি অত্যন্ত ভঙ্গুর ও স্বার্থদ্বন্দ্ব জর্জরিত জোট। ব্রিকস সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় পশ্চিমা আধিপত্য এবং বিশেষ করে মার্কিন ডলারের একচ্ছত্র বিশ্বায়নকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সংস্থাটি বাস্তবে সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ এর প্রধান দুই অংশীদার চীন ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। চীন চায় দীর্ঘমেয়াদে মার্কিন প্রভাবের বিপরীতে একটি চীনকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে, অন্যদিকে ভারত কখনোই ব্রিকসকে চীনের আজ্ঞাবহ বা মার্কিন বিরোধী চরমপন্থী কোনো অক্ষ হিসেবে রূপ নিতে দিতে রাজি নয়।

সম্মেলন শেষে গৃহীত যৌথ ঘোষণাপত্রে একতরফা নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্যিক ... যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা ক্লিয়ারলি যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধেই নির্দেশিত। ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, রাশিয়া ও চীনের মতো বৈরী স্বার্থের দেশগুলোকে একটি টেবিলে আনা ভারতের কূটনৈতিক সফলতা হলেও, কাঠামোগত দিক থেকে ব্রিকস এখনো একটি অত্যন্ত ভঙ্গুর ও স্বার্থদ্বন্দ্ব জর্জরিত জোট।

দ্বিতীয়ত, ব্রিকস সম্মেলনের প্রকৃত ফলাফল এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এর কার্যকারিতা কতটুকু তা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করা দরকার। সম্মেলন শেষে গৃহীত যৌথ ঘোষণাপত্রে যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা মূলত পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধেই নির্দেশিত। ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, রাশিয়া ও চীনের মতো বৈরী স্বার্থের দেশগুলোকে একটি টেবিলে আনা ভারতের কূটনৈতিক সফলতা হলেও, কাঠামোগত দিক থেকে ব্রিকস এখনো একটি অত্যন্ত ভঙ্গুর ও স্বার্থদ্বন্দ্ব জর্জরিত জোট।

ব্রিকস সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় পশ্চিমা আধিপত্য এবং বিশেষ করে মার্কিন ডলারের একচ্ছত্র বিশ্বায়নকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সংস্থাটি বাস্তবে সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ এর প্রধান দুই অংশীদার চীন ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

না। তবে এই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশকে কিছু বাস্তবমুখী কূটনৈতিক ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে না যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রের বার্তা দিয়েছে, কিন্তু এতে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক আস্থার ঘাটতি যেন আরও দীর্ঘস্থায়ী বা জটিল রূপ না নেয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। দিল্লির সঙ্গে দ্রুত এক কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম উন্মুক্ত করে পানি, সীমান্ত, বাণিজ্য এবং ট্রানজিটের

মতো বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানে আন্তরিক ও সম মর্যাদাপূর্ণ আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা দক্ষতার সঙ্গে বজায় রাখতে হবে।

চীনের সঙ্গে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক বাজার ধরে রাখা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো কৌশলগত উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াই বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করবে।

ব্রিকস সম্মেলনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য কোনো কূটনৈতিক বিপর্যয় নয়। এটি বিচ্ছিন্নতার সংকেতও নয় বরং এটি ছিল এক হিসাব-নিকাশ করা কৌশলগত অবস্থান। কিন্তু এর সফলতা নির্ভর করবে আগামী দিনের কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর। যদি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ, মর্যাদাশীল ও ফলাফলমুখী দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের রূপরেখা তৈরি করতে পারে এবং চীন ও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর মাঝে নিজের অবস্থান সুরক্ষিত রাখতে পারে, তবে ব্রিকস সম্মেলনে না যাওয়ার এই প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে দেশীয় কূটনীতির এক বার্তা হিসেবেই ইতিহাসে স্থান করে নেবে।

ওয়াসিম ফারুক

লেখক : কলামিস্ট